ইস্পাতের কাঠামো

অন্নদাশঙ্কর রায়

উক্তিটা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসকে তিনি বলেছিলেন 'স্টীল ফ্রেম'। প্রায় দু'শো বছর ধরে এই সার্ভিস বা এর পূর্ববর্তী বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিস, তথা বম্বে সিভিল সার্ভিস এত বিশাল সাম্রাজ্যকে শক্ত হাতে ধরে রাখে। অসামরিক প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে এর করায়ত্ত। আর্মি ব্যতীত অন্য সর্বত্র এর সভ্যদের প্রাধান্য।

মোগল বাদশাহদেরও একটা সিভিল সার্ভিস ছিল। তবে সামরিক বিভাগের কাছে অসামরিক বিভাগ ছিল খাঁটো। এখন যেমন হয়েছে পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে। ব্রিটিশ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছে স্বাধীন ভারত, মোগল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী স্বতন্ত্র পাকিস্তান তথা স্বতন্ত্র বাংলাদেশ। কিন্তু ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের উত্তরাধিকারী খুঁজলে পাকিস্তানে পাওয়া যেতে পারে, বাংলাদেশের কথা বলতে পারব না, কিন্তু ভারতে লোপ পেয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একটা জুডিসিয়াল ব্রাঞ্চও ছিল। একজিকিউটিভ ব্রাঞ্চই একমাত্র নয়। হাই কোর্টের জজদের তিন ভাগের একভাগ নিযুক্ত হতেন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জুডিসিয়াল ব্রাঞ্চ থেকে। জেলায় যেমন একজন কলেক্টর তথা ম্যাজিস্ট্রেট থাকতেন তেমনি একজন জজও থাকতেন। দুই ব্রাঞ্চের দুই কর্তৃপক্ষ। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে রাজ্যকে ভাগ করা হয় জেলার ভিত্তিতে। তার আগে ছিল পরগণার ভিত্তি। প্রত্যেক জেলায় রাজস্ব আদায় করার জন্য একজন ইংরেজ কলেক্টর নিয়োগ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বা কিছুদিন পরে আর একজন ইংরেজ অফিসারকে পাঠানো হয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত পরিচালনা করতে। তিনি একাধারে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট। কলেক্টর তাঁর কাচারিতে আর জজ তাঁর আদালতে সর্বেসর্বা। কিছু কাল পরে দেখা গেল জজ সাহেব ঘুরে বেড়াতে পারেন না, তিনি স্থিতিশীল। শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করতে হলে, পুলিশের থানা পরিদর্শন করতে হলে, কান মলে রাজস্ব আদায় করতে হলে একজন গতিশীল ম্যাজিস্ট্রেট চাই। নতুন কোনো অফিসার না পাঠিয়ে কলেক্টরকেই ম্যাজিস্ট্রেট পদ দেওয়া হয়। তাঁর সাগরেদ হন একজন জুনিয়র অফিসার। তাঁকে বলা হয় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট! তিনিও ইংরেজ।

ক্রমশ কাজ বেড়ে যায়। প্রজাদের সুবিধার জন্যে জেলাকে মহকুমার ভিত্তিতে ভাগ করা হয়। এক একটি বিরাট জেলায় দুটি বা তিনটি বা চারটি মহকুমা সৃষ্টি হয়। চব্বিশ পরগণায় তো পাঁচটি মহকুমা, প্রদেশ ভাগের পরে ছ'টি। প্রত্যেক মহকুমায় একজন করে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু কোথায় এতগুলি ইংরেজ সিভিলিয়ান? অগত্যা ভারতীয়দের জন্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ প্রবর্তন করা হয়। তাঁরা ডেপুটি কলেক্টরও বটে। তাঁদের সার্ভিসের নাম রাখা হয় প্রোভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস। ওদিকে জজেরও তো কাজ বেড়ে যাচ্ছিল। তাঁরও তো সহযোগী দরকার। মুনসেফ বলে একটা পদ আগে থেকেই ছিল। সেটা মোগল আমলের। সে পদে নবশিক্ষিত দেশীয় যুবকদের নিয়োগ করা হয়। তাঁদের সার্ভিসের নামও প্রোভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস, কিন্তু তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় জুডিসিয়াল। মুনসেফদেরও প্রত্যেক মহকুমায় মোতায়েন করা হয়, কোথাও দু'জন করে। মহকুমার সদর ছাড়া অন্যত্র তাঁদের জন্যে 'চৌকি' ছিল। তাতে লোকের সুবিধা। তাঁদের অসুবিধা।

মহকুমা হাকিমদের কাজ বেড়ে যায়। তখন তাঁদের সাহায্য করার জন্যে একজন বা দু'জন সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা সাব ডেপুটি কলেক্টর পাঠানো হয়। এঁদের সার্ভিসের নাম সাবর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস। এমন কর্মই নেই যা এই বেচারিদের দিয়ে করানো না হয়। অথচ এঁদের মাইনে সবচেয়ে কম। ইদানীং এরাও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। শতাব্দীব্যাপী অবিচারের প্রতিকার হয়েছে। আমি যখন নওগাঁ মহকুমার সাবডিভিজনাল অফিসার তখন আমার সেকেন্ড অফিসার ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাব ডেপুটি। তাঁর হাতেই অফিসের কাজকর্ম সঁপে দিয়ে আমি চলে যেতুম গ্রামে গ্রামে ঘুরতে। গ্রামেই ডেরা বাঁধতুম। একজন অনরারি ম্যাজিস্ট্রেটকেও প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে পুলিশ কেস বিচার করতে দেওয়া চলত না। তিনি করতেন বেসরকারী অভিযোগের বিচার। যাকে বলে কমপ্লেন্ট কেস। কুস্টিয়া মহকুমায় একজন সাব-রেজিস্ট্রারকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট করে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর এজলাসে পুলিশ কেস পাঠাতে আপত্তি ছিল না।

পুলিশ কেস সম্বন্ধে কড়াকড়ির কারণ ছিল। আসামীকে খালাস দিলে বা যথেষ্ট শাস্তি না দিলেও পুলিশ থেকে বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগানো হতো। আমাকেও এরজন্যে জবাবদিহি করতে হয়েছে। পুলিশের আস্পর্ধাও কম নয়। থানার পরিদর্শনের খাতায় বাঁকুড়া জেলার ইংরেজ পুলিশ সাহেব আমার পূর্ববর্তী মহকুমা হাকিমদের রায়ের বিদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন। আমিও সেই খাতাতেই তাঁর বিদ্ধে প্রতিবাদ করি। ব্যাপার অনেকদূর গড়ায়। ইংরেজ কমিশনার আসেন জেলা পরিদর্শনে। পুলিশ সাহেবের অতিথি হন। তিনি গায়ে পড়ে আমার বিদ্ধে লেখেন। আমি ছুটি নিই। অন্যত্রও পুলিশ আমার বিদ্ধে রিপোর্ট করেছে, যিনি করেছেন তিনি ইংরেজ ডি .আই.জি। চীফ সেক্রেটারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন আমার কেসগুলো পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে। তিনি তথ্য ও সংখ্যা উদ্ধৃত করে রিপোর্ট দেন যে আমার কোর্টে শতকরা সত্তরজনের উপর আসামী শাস্তি পেয়েছে ও শাস্তি যথেষ্ট কড়া।

প্রত্যেকটি উপরওয়ালার উচচারিত বা অনুচচারিত নির্দেশ পুলিশ কেসে যত বেশী শাস্তি হয় তত ভালো, যত ডিটারেন্ট শাস্তি হয় তত ভালো। সফল ম্যাজিস্ট্রেট যাঁরা তাঁদের একজন আমাকে বলেছিলেন, " তুমি যত পারো শাস্তি দাও, ওরা আপীলে খালাস হবে। তোমার ভাবনা কিসের?" আমার ভিতরে একটা জুডিসিয়াল বিবেক ছিল। তাই আমি পুলিশের মুখ চেয়ে শাস্তি দিইনি। আবার একজন ম্যাজিস্ট্রেটও ছিল যে কড়া াতে অপরাধ দমন করতে চায়। একবার ম্যাজিস্ট্রেট, একবার জজ, এমনি করে আমাকে পরীক্ষা করার পর উপরওয়ালারা জজই করেন। সেখানেও পুলিশের সঙ্গে অপ্রীতি একই কারণে কিন্তু হাইকোর্ট আমারি পক্ষে।

একই সার্ভিসে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট থাকায়, একই অফিসার পর্যায়ত্রমে দুই পদে কাজ করায় প্রশাসনের উভয় দিকই একজনের পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল। পুলিশের সঙ্গে আমার বোঝাপড়াও হয়েছিল। পুলিশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই কর্তব্যপরায়ণ সৎ লোক। দোষ যা তা সিস্টেমের। যারা সত্যিকার অপরাধী তারা আইনের ফাঁক দিয়ে সহজেই পার পেয়ে যায়। অপরাধ প্রমাণ করা তো পুলিশের দায়। সাক্ষ্য যথেষ্ট না হলে বা আইনে ফাঁক থাকলে পুলিশ করবে কী? উকিলেরা আসামীকে খালাস করিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। তা সে যত বড়ো শয়তানই হোক। কখনো কখনো সাক্ষী হাত করে নেন। সরকারী উকিল যা পান আসামীর উকিল তার চেয়ে ঢের বেশী পান। ফী আরো বাড়িয়ে না দিলে সরকারের কাজ করতে বড়ো বড়ো উকিলেরা রাজী হন না। পুলিশের অসুবিধা অনেক বলেই পুলিশ বাধ্য হয়ে বাঁকা রাস্তায় চলে। আশা করে হাকিমও চোখ বুজে দোষী সাব্যস্ত করবেন ও কঠোরতম দন্ড দেবেন। মামলা ফেঁসে গেলে পুলিশকেই তো জবাবদিহি করতে হয়। পাবলিক চটে যায়।

এর প্রতিকার কি ম্যাজিস্ট্রেটদের হাত থেকে বিচারভার কেড়ে নিয়ে মুনসেফদের হাতে দেওয়া? পরিদর্শনের ভার কি জজের উপরে দেওয়া? জানিনে আজকাল ক'জন জজ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজকর্ম পরিদর্শন করেন, থানায় গিয়ে পুলিশের কাজকর্ম পরিদর্শন করেন। আজকাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোডের কয়েকটা শান্তিরক্ষার ধারায় নিবদ্ধ। তাঁরা বিচারও করেন না, আপীলও শোনেন না। শান্তিভঙ্গ না হলে তাঁরা অপরাধ দমনে উদাসীন। ক'জন অপরাধী ধরা পড়ল, ক'জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হল, ক'জন শাস্তি পেল, সে শাস্তি যথেষ্ট গুতর কি না এসব এখন তাঁদের এত্তিয়ারভুক্ত নয়। যাঁদের এত্তিয়ারভুক্ত তাঁরা কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য কিনা আমি তো জানিনে। আজকাল কেস চলে যায় সরাসরি হাইকোর্টে বা সুপ্রীম কোর্টে। না, এ সিস্টেমও আমার মতে নিখুঁত নয়। এতে অপরাধ বাড়ছে বই কমছে না। আমরা তো নিয়মিত জেল পরিদর্শন করতুম। বিনা বিচারে কেউ কোন দিন আটক থাকলে তার বিচার

ত্বরান্বিত করতুম বা তাকে খালাস দিতুম। বত্রিশ বছর বিনা বিচারে জেলখানায় পচছে, সুপ্রীম কোর্ট না জানলে প্রতিকার হচ্ছে না, এ রকম ব্যাপার তো একটি দুটি নয়। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কি কেস ডায়েরিতে নোট করে রাখেন না কোন্ কোন্ কেস বছরের পর বছর ঝুলছে। সামান্য গাফিলতির জন্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই. সি. এস. থেকে অপসারিত হন। আজকাল ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের কোনো জুডিসিয়াল ব্রাঞ্চ নেই। একজিকিউটিভ অফিসাররা বিচারাধীন আসামীর জন্যে দায়ী নন। দায়ী তা হলে কে? জুডিসিয়াল সার্ভিসের অফিসাররা? ক্ষমতা কেড়ে নিলে দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। বিচারাধীন কয়েদীকে অন্ধ করে দেওয়া হলো, অথচ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানলেন না, জেলা জজও অন্ধকারে। আগেকার দিনে মহকুমা হাকিমরা সপ্তাহে দু'তিন দিন জেলা পরিদর্শন করতেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা মাসে একদিন। জেলা জজেরাও তিন মাসে একদিন। এ দায়িত্ব এখন কাদের উপর বর্তেছে? জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টেরা তো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টেরাও তাই। এখনও কি তাঁরই নিয়ন্ত্রণে? না কারো নিয়ন্ত্রণে নন? লোকে অরাজকতার কথা এত বলছে, কিন্তু রাজা রাজড়ার তো লেখাজোখা নেই। ব্যুরোক্রাসী আরো বর্ধিষ্ণু। মন্ত্রীসংখ্যাও তো বর্ধনশীল। হিসাব নিলে দেখা যাবে আগেকার দিনের স্টীল ফ্রেমের পেছনে ঢের কম খরচ হতো। ফৌজদারি মামলা বিলম্বিত হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে বকুনি খেতে হতো। বিচারকারী হাকিমকেও, তদন্তকারী পুলিশকেও। আজকাল কি তিনি কোর্ট ও থানা পরিদর্শন করেন? সুরেন্দ্রনাথের কার্যকালে হপ্তায় হপ্তায় বকেয়া মামলার স্টেটমেন্ট পেশ করতে হতো। আজকাল কি সে প্রথা বহাল আছে?

স্টীল ফ্রেমের মধ্যমণি ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তথা কলেক্টর। তাঁর নজর ছিল জুডিসিয়াল ভিন্ন অন্য সমস্ত বিভাগের উপরে। তাঁর কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টকে এই সব বিভাগের প্রধানরা সকলেই ডরাতেন। তাঁদের প্রমোশনও নির্ভর করতো এর উপরে। এই পদটি মোগল আমলে ছিল না, এটা ব্রিটিশ আমলেরই প্রবর্তন। কেবল জজই ছিলেন তাঁর এত্তিয়ারের বাইরে। জজের অধীনস্থ অফিসারদের সম্বন্ধে জজই রিপোর্ট পাঠাতেন। ক্রমে ক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপালিটি, স্কুল বোর্ড ইত্যাদি বেরিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর মনোনীত ব্যক্তিরা এসব প্রতিষ্ঠানে থাকতেন। সেই সূত্রে মহকুমা হাকিম হিসাবে আমিও ছিলুম জেলা বোর্ডের সদস্য। ভোটদানের অধিকারও আমার ছিল। হস্তক্ষেপ না করেও কণ্ঠক্ষেপ করতে পারা যেত। বোর্ডের কর্মকর্তাদের গলদ দেখিয়ে দেবার সুযোগ তো ছিলই।

আজকাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নাকি জেলা বোর্ডের অন্যতম কর্মকর্তা রূপে আজ্ঞাধীন করা হয়েছে। ঠিক বলতে পারব না, কারণ আমি তেত্রিশ বছর হলো সরকারী পরিমন্ডলের বাইরে। সতেরো বছর হলো জেলা থেকেও দূরে। কলকাতা থেকে বীরভূম বহু দূর। তা ছাড়া আমার কোনো চাড় নেই। একটা বিশেষ বয়সের পর বাণপ্রস্থই বিধেয়। সৃষ্টির কাজ অসমাপ্ত পড়ে আছে। তবে দেশ বিদেশের সংবাদপত্র আমি নিয়মিত পড়ি। দেশ বিদেশের খবর রাখি। কিন্তু জেলাগুলির সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন। অতীতের সঙ্গে তুলনা করব তো? কী দরকার বিভিন্ন পার্টির সমালোচনা করে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস সরকারী নীতি নির্ধারণ করার ভার মন্ত্রীমন্ডলের, কিন্তু সে নীতি কাজে পরিণত করার ভার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি দায়িত্বশীল অফিসারদের। তাঁদের ক্ষমতা কমিয়ে দিলে দায়িত্বও কমিয়ে দেওয়া হয়। তার পরে যদি তাঁদের বকাঝকা করা হয় তবে সেটা অন্যায়। আপনি কোথায় যাবেন, বলুন। ড্রাইভার আপনাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি তার হাত থেকে স্টীয়ারিং হুইল কেড়ে নেন তা হলে তাকে বকুনি দেওয়া তার উপর অবিচার নয় কি? আপনি সম্ভবত একজন সর্বজ্ঞ পুষ, কিন্তু আপনার দলের লোকেরাও কি একজন অভিজ্ঞ অফিসারের চেয়ে জ্ঞানবান? আগেকার দিনে আমাদের একটা পলায়নের পথ ছিল। আমরা জজ হতে পারতুম। এখন সে পথ খোলা নেই। ম্যাজিস্ট্রেটরা কেউ পরে জজ হতে পারেন না। এটা তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব করে। তবে সদাশয় সরকার আজকাল বিশ বছর চাকরির পর পুরো পেন্সনে অবসর নিয়ে দেন।বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর বয়সে পুরো পেন্সনে অবসর নিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করা সম্ভব। অনেকেই এই পথে পলায়ন করছেন। ফলে সরকারকে কাজ চালাতে হচ্ছে অভিজ্ঞ অফিসারদের জায়গায় তণ অফিসারদের দিয়ে। এঁরাও দেখতে দেখতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে প্রমোশন পাচ্ছেন। পুলিশেও একই দৃশ্য। তারপর এরা চটপট সেক্রেটারি হচ্ছেন। ইস্পাতের কাঠামো কি এইভাবে রক্ষা করা সম্ভব? হতে পারে যে ইস্পাতের কাঠামোর সঙ্গে দেশবাসীর উপর অত্যাচার জড়িত ছিল। সুতরাং গেছে, আপদ গেছে। গোটা আই. সি. এসটাই একই দিনে গেলে আরো ভালো হতো। কয়েকজন আরো কিছুকাল থেকে গেলেন কেন?

পান্ডের সঙ্গে আরো দশজন আই. সি. এস ও আগেকার দিনের মতো আই. পি. এস অফিসার থাকলে পাঞ্জাবের প্রশাসন হয়তো এমনভাবে ভেঙে পড়ত না যে আ

র্মিকে ডাকতে হতো ও রাখতে হতো । ব্রিটিশ আমলে আর্মিকে কখনো কখনো ডেকে আনলেও সিভিল পাওয়ারকে অতখানি পাওয়ারলেস করতে হয়নি। হয়েছিল সম্ভবত সিপাহী বিদ্রোহের সময়। তারপরে পাঞ্জাবে ১৯১৯ সালে একবার মার্শাল ল জারি করা হয়। সেই সময়েই জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ঘটে। কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল আবার এক সিপাহী বিদ্রোহ ঘটতে যাচ্ছে। চারদিক থেকে প্রতিবাদ ওঠায় মার্শাল ল রহিত হয়। এবার মার্শাল ল জারি হয়নি। তা না করে যতদূর যাওয়া চলে ততদূর যাওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে সে বিচার আমি করব না। আমি শুধু ক্ষণ্ণ হচ্ছি একথা শুনে যে সিভিল অভিসারদের পাইকারীভাবে পাঞ্জাব থেকে রাজ্যন্তরে বদলী করার প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। আই. এ. এস তথা আই. পি. এস অফিসারদের সবাইকে না হোক অধিকাংশকেই সন্ত্রাসবাদীদের সহানুভূতিশীল বা নরম বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। শুনছি অন্যান্য রাজ্য থেকে বদলি হয়ে এঁদের জায়গায় যেতে বিশেষ কেউ রাজী হচ্ছেন না। তাই যদি হয় এঁরাই শেষপর্যন্ত থেকে যাবেন ও বহুলোকের অনাস্থাভাজন হবেন। পান্ডে মানে মানে সরে পড়েছেন। তিনি আগেই অবসর নিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে পদত্যাগটা জীবিকাত্যাগ নয়। অপরের পক্ষে সেটা জীবিকাত্যাগ, কারণ আগেকার মতো তাঁরা জজ হয়ে রেহাই পেতে পারেন না। শুনেছি পাকিস্তানে এখনো সে নিয়ম বলবৎ রয়েছে।

আমি যখন প্রথমবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হই তখন দেখি আমার কনফিডেনশিয়াল বাক্সয় একটি পুস্তিকা রয়েছে। তাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে আর্মিকে ডাকলে আর্মির কমান্ডারই হবেন আমার চেয়ে বড়ে, আমি হব তাঁর চেয়ে ছোট। নিজের বিচার বিবেচনা অনুসারে তিনি কাজ করবেন, হুকুম দেবেন, আমার বিচার বিবেচনা অনুসারে নয়। আর্মির হাতে পরিস্থিতিটা ছেড়ে দিলে ওরা কাকে ধরবে, কাকে মারবে তা ওরাই জানে। অথচ লোকে দায়ী করবে আমাকেই। আসল ব্যাপার আর্মি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ হচ্ছে প্রাদেশিক সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই তঁার জেলায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আর্মির হাতে পরিস্থিতি তুলে দিলে তিনি আর শ্রেষ্ঠ নন। কমান্ডারই শ্রেষ্ঠ। হয়তো তিনি একজন লেফটন্যান্ট কর্নেল কি মেজর। আমার চেয়ে তাঁর র‍্যাঙ্ক নিচে। কেন আমি নিজের অপমান নিজে ডেকে আনব? আমি সাবধান হই। ব্রিটিশ আমলে আর্মিকে কখনো ডাকিনে।

পার্টিশনের পর আমাকে জেলার ভার দিয়ে যেখানে পাঠানো হয় সেটা একটা সীমান্তবর্তী জেলা। নদী পার হয়ে পাকিস্তানীরা এসে হামলা করত। নদীর চরও পাকিস্তানের বলে দাবী করত। নদীপথ দিয়ে নৌকা গেলে আটক করত ও মাঝিদের ধরে নিয়ে যেত। পুলিশ ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না দেখে আমি মিলিটারিকে স্মরণ করি। ডাকিনি, শুধু একবার দেখে যেতে বলেছি। সেইসূত্রে ব্রিগেডিয়ার, মেজর জেনারেল ও আরো কয়েকজন বিবিধ নিচের র‍্যাঙ্কের অফিসার। তাঁদের পরামর্শ, "মিলিটারিকে ডাকলে মিলিটারি আসবে ঠিকই, কিন্তু অপর পক্ষেও তো মিলিটারি আসবে। আমাদের পক্ষের একজন জওয়ানও যদি মারা যায় তবে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে। আপনি কি সেটা চান?" আমি বলি, "না। তা হলে উপায়?" তারাঁই পরামর্শ দেন রাজ্য সরকারের সশস্ত্র পুলিশকে ডাকতে। সশস্ত্র পুলিশ এলে আমার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে ভয় দেখান। "সার, পুলিশ কি মরতে এসেছে? একটিও পুলিশের লোক যদি মরে তবে সমস্ত পুলিশ বিদ্রোহ করবে।"

রাজ্য সরকার সশস্ত্র পুলিশ পরিচালনার জন্যে পাঁচজন অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমার অধীনে নিযুক্ত করেন। এঁরা সবাই প্রাক্তন মিলিটারি অফিসার। একজন উইং কমান্ডার, একজন লেফটন্যান্ট কর্নেল, দু'জন মেজর, একজন ক্যাপ্টেন। আমরা সুচিন্তিত কৌশলে চর দখল করি যাতে একটিও মানুষ না মরে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারা গেল না। একটা চর ছিল যেটার মাঝখানেই সীমান্তরেখা। একখানা ঘরের এক অংশ ভারতে, অপর অংশ পাকিস্তানে। পুলিশে পুলিশে সঙঘর্ষ। আমাদেরই একটি কনস্টেবল মরে। আমার অনুশোচনার অবধি থাকে না। ওটা দখল করতে না গেলেই হতো। কিন্তু আমি তো সে সময় সেদিকে ছিলুম না। চার্জে যিনি ছিলেন তিনি ছেলেমানুষ। আর তিনিই যখন চার্জে তখন আমি হস্তক্ষেপ করি কী করে? মিলিটারি বা আধা-মিলিটারিকে ডাকার এইখানেই বিপদ। অনর্থ একটা ঘটবে, তখন আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।

আরো এক কান্ড ঘটে। অন্য একটা চর দখল করতে গিয়ে আরেক অফিসার সীমান্তরেখা পার হয়ে যান। দেখেন রেখার ওপারে কতকগুলি কুটির, তাতে বাস করছে যারা তারা পাকিস্তানী নাগরিক। আমার সহকর্মী তাদের খেদিয়ে তো দিলেনই, তাঁদের কুঁড়েঘরগুলিতেও আগুন লাগিয়ে দিলেন। আমাকে জানালেন যে ওরা

নিজেরাই নিজেদের ঘরে আগুন দিয়ে পালিয়েছে। আমি সরল বিশ্বাসে রিপোর্ট পাঠালুম সেই মর্মে। দৃশ্যটা ওপার থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব প্রভৃতি নিরীক্ষণ করছিলেন। তাঁদের রিপোর্ট আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমার কাছে যে রির্পোট পেয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গ সরকারকে জানিয়ে দেন যে সত্য আমাদের দিকে। অত তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে অবশ্য যুদ্ধ বেধে যায় না। কিন্তু বাধতেও তো পারত। আমাদের কেসটা সব সময় ঠিক হওয়া চাই। আমি তো প্রাক্তন মেজরকে অভিনন্দন করে সকলের সামনে তাঁর সাহসের প্রশংসায় মুখর, এমন সময় সংশ্লিষ্ট সাব-ডিভিশনাল অফিসার আমার কানে কানে বললেন, মেজর সাহেব স্বহস্তে আগুন ধরান। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। লোকগুলো প্রাণের ভয়ে পালায়।'

না, মিলিটারিকে বা প্রাক্তন মিলিটারি অফিসারদের হাতে কখনো সর্বময় ক্ষমতা তুলে দিতে নেই। যুদ্ধের সময় সব কিছুই চলে, শান্তির সময় চলে না। হাইকোর্ট উঠে যায়নি, সুপ্রীম কোর্ট উঠে যায়নি। তাঁদের কাছে যে কোনো ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করতে পারে। মিলিটারি নেসেসিটি বলে আইনের শাসন থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। তা করতে গেলে আইনটাই বদলে দিতে হয়। স্বৈরতন্ত্রী পাকিস্তানে ওসব সম্ভব, এদেশে গণতন্ত্র বিদ্যমান। যখন গণতন্ত্র ছিল না তখন ব্রিটিশ ভারতে কত কী হয়েছে, কিন্তু সেসব আইন বাঁচিয়ে। ওরা যে কারণে এতকাল ছিল সেটা আইনের শাসন। অরাজকতার চেয়ে আইনের শাসন ভালো, এই জন্যেই ভারতের লোক সেটা সহ্য করেছিল।

আইনের শাসনের জন্যেই সিভিল সার্ভিস দরকার। মোগলরাও এটা বুঝত। তাদেরও একটা সিভিল সার্ভিস ছিল। তাদের সিভিল সার্ভিসের শতকরা পঞ্চাশ জন আমলা ছিলেন বিদেশী ইরানী, তুরানী প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান। বাকী পঞ্চাশ জনের অর্ধেক ছিলেন দেশীয় মুসলমান ও অর্ধেক রাজভক্ত হিন্দু। উচচতর পদগুলি সাধারণত বহিরাগত মুসলমানের জন্যেই বাধাঁ। তাঁরা অবসর নেবার পর যে যার দেশে ফিরে যেতেন, কিন্তু এদেশের সম্পত্তি ওদেশে নিয়ে যেতেপারতেন না। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। সেইজন্যে থেকেই যেতেন বেশীর ভাগ। ভারতকেই স্বদেশ মনে করতেন। ভারতের ধন ভারতেই থাকত। মোগল রাজত্ব এতকাল থাকার সেটাও একটা কারণ। বলা বাহুল্য, ইংরেজরা এ দেশের ধন ওদের দেশে নিয়ে যেতেন। তাঁরা এদেশে থাকবেন না বলে স্থির করেই এদেশে আসতেন।

গোড়ার দিকে সিভিল সার্ভিসের শতকরা একশোটা পদই ছিল ওদের। কিন্তু রাণী ভিক্টোরিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারত সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করার সময় যে ঘোষণাপত্র দেন তাতে ভারতীয় প্রজাদের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। তখন বিলেতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগীতায় ভারতীয় প্রজাদেরও বসতে দেওয়া হয়। উচচস্থান অধিকার করতে পারলে তাঁদেরকেও সমান শর্তে চাকরি দিতে হয়। প্রথম দিকে কম ভারতীয়ই বিলেত গিয়ে সফল প্রতিযোগী হতেন। কিন্তু পরে তাঁদের সংখ্যা বাড়ে। তখন গাত্রদাহ আরম্ভ হয়। ইচ্ছে করে নিয়মকানুন এমনভাবে বদলে দেওয়া হয় যে এখানকার পড়া শেষ করে ওখানে গেলে দেখা যেত প্রতিযোগীতায় বসার বয়স পার হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙালীর বুদ্ধির সঙ্গে এঁটে ওঠে কার সাধ্য। বাপেরা ছেলেদের পাঠিয়ে দিতে লাগলেন পনেরো ষোল বছর বয়সে বা আরো আগে। শ্রী অরবিন্দকে তো পাঁচবছর বয়সে। তখন এমন কোনো নিয়ম ছিল না যে পরীক্ষায় বসার আগে গ্রাজুয়েট হতে হবে। ইংরেজদের ছেলেরাও গ্রাজুয়েট না হয়েই প্রতিযোগীতায় সফল হতে পারতেন। যথা, সার হেনরি হুইলার, বিহার ওড়িশার গর্ভনর। ভারতীয় প্রতিযোগীরাও যে কখনো সফল হতেন না তা নয়। পরে হৈ চৈ পড়ে যায়। নিয়মকানুন আবার বদলায়। কিন্তু ভারতীয় প্রতিযোগীদের সংখ্যা আরো বাড়ে। বাঙালীরা যদিও অগ্রণী তবু অন্যান্য প্রদেশবাসীরাও পেছিয়ে থাকে না। শেষের দিকে ইংরেজরা একটা সীমা বেঁধে দেয়। শতকরা পঞ্চাশ জন হবে ইউরোপবাসী ব্রিটিশ প্রজা, আর সকলে ভারতবাসী ব্রিটিশ প্রজা। তাদের মধ্যে কতক মাইনরিটি সম্প্রদায়ভুক্ত। এটা চালাতে গিয়ে দেখা গেল বিলেতে গিয়ে যাঁরা প্রতিযোগীতায় সফল হচ্ছেন তাঁদের সংখ্যাই অধিক থেকে অধিকতর হচ্ছে। তাঁদের ঠেকিয়ে রাখার কোনো ভদ্র উপায় নেই। কালক্রমে ইংরেজ সিভিলিয়ানরাই মাইনরিটি হবেন, প্রমোশন পেয়ে ভারতীয়রাই তাঁদের উপরওয়ালা হবেন। অকল্পনীয়! অসহ্য! প্রতিযোগীতা তো তুলে দেওয়া যায় না। সার্ভিসটাকেই গুটিয়ে নেওয়া হোক। ক্ষমতার হস্তান্তর মানে আই. সি. এসের বিলোপ। যাঁরা থাকেন তারা আই. এ. এস. হিসাবেই গণ্য হন। যদিও চাকরির শর্ত আগের মতো। পরে শর্তের খেলাপ হয়। অবসর গ্রহণের বয়স কমিয়ে দিয়ে তাঁদের বিদায়। যে দুটি একটিকে গভর্নররূপে পুনর্নিয়োগ করা হয় তাঁদের মধ্যে ব্রিজকুমার নেহকে অকারণে কাশ্মীর থেকে বদলি করা হয়, ভৈরবদত্ত পান্ডেকে পাঞ্জাব থেকে সরে যেতে হয়। মিলিটারির সঙ্গে জুত হয়নি নিশ্চয়।

অপরপক্ষে স্বাধীনতার পরে কোনো কোনো আই. সি. এসের ভাগ্যে যা মিলেছে তা স্বপ্নের অধিক সৌভাগ্য। ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে তাঁরা লন্ডনে, ওয়াশিংটনে, মস্কোতে, টোকিওতে, প্যারিসে, বনএ নিযুক্ত হয়েছেন। ইউনাইটেড নেশনসে ভারতের প্রতিনিধি হয়েছেন। গভর্নর তো হয়েছেনই। সবচেয়ে আদের কথা আশি বছর পার হলেও কেউ কেউ এখনো চাকরি করে যাচ্ছেন। যথা, ব্রিজকুমার নেহ। সত্তর ছুঁই ছুঁই হয়েও ভৈরবদত্ত পান্ডেএই সেদিন পর্যন্ত চাকরি করেছেন। বয়সের সীমা ষাটের জায়গায় আটান্ন করে যদি অনেককে লাঞ্ছিত করা হয়ে থাকে তবে বেছে বেছে কতককে তো সম্মানিত করা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে কেউ কেউ ষাট বছরের আগে গর্ভনর বা বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য পদে অভিষিত্ত হতেন, সেই কজনই ষাটের পরেও দু'তিন বছর চাকরি করতে পারতেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে যেক্ষেত্রে রাজনীতিকরা হালে পানি পান না সেক্ষেত্রে আই.সি.এস নিয়োগ না করে আর কী উপায় আছে? মিলিটারি অফিসার নিয়োগ? যেমন পাকিস্তানে হয়। না, এদেশে এখন পর্যন্ত সিভিল পাওয়ার সর্বোচ্চ। এর জন্যে আমরা সকলেই গৌরব বোধ করতে পারি। সিভিল পাওয়ার সর্বোচ্চ থাকবে। মহাত্মা গান্ধী আমাদের সতর্ক থাকতে বলে গেছেন, সিভিল পাওয়ার বনাম মিলিটারী পাওয়ার এই দ্বন্দ্ব ভারতেও দেখা দিতে পারে। তাঁর প্রয়াণের পরে দেখা দিয়েছেও, কিন্তু ভারতে নয়, তার দুই বিচ্ছিন্ন অঙ্গে। পাকিস্তানে তথা বাংলাদেশে। তাদের সর্বোচ্চ আইন বলতে বোঝায় সামরিক আইন। পাকিস্তানে তার অনুপান হচ্ছে শরিয়ত আইন। ভারতে আমরা হয়তো দেখব মনুসংহিতার পুনর্জন্ম।

স্টীল ফ্রেম গণতন্ত্রের সঙ্গে বোধহয় খাপ খায় না। অন্তত প্রাচ্য দেশে। বৃদ্ধ আই. সি. এসদের দেহত্যাগের পর এরও বিলয় ঘটবে হয়তো। তবে এর দুটো কি একটা প্রথা যদি চলিত থাকে তা হলে গণতন্ত্রের দিক থেকে না হোক জাতীয়তাবাদের দিক থেকে সুরাহা হবে। নয়তো নেশনটাই ভেঙে পড়বে। আগেকার দিনে কেউ দাবী করতে পারতেন না যে তাঁকে তাঁর নিজের প্রদেশেই নিয়োগ করতে হবে, যেহেতু তিনি নিজের ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়োগ করা হয়েছিল বম্বেতে, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে যুক্তপ্রদেশে, আলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাদ্রাজে। তেমনি বাংলাদেশে নিয়োগ করা হয়েছিল বেনেগল নরসিংহ রাওকে, নীলকণ্ঠ মহাদেব আয়ারকে, মোতিরাম খুশিরাম কৃপালানীকে। এঁরা ইন্ডিয়ান হয়ে ইন্ডিয়ায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, বাঙালী হয়ে বাঙলার বাইরে না, অবাঙালী হয়ে বাঙলায় না। আজকাল তো রাজ্য সরকারই ধুয়ো ধরছেন যে বাইরে থেকে কেউ নিযুক্ত হবেন না। মোক্ষম যুক্তি তাঁরা আঞ্চলিক ভাষা বোঝেন না। সেকালে ইংরেজরাও আঞ্চলিক ভাষা শিখতে বাধ্য হতেন। এটা কোনো যুক্তিই ছিল না। কিন্তু সরকারী কাজকর্ম চলত ইংরেজীতে। ইদানিং সেটা অচল হওয়ায় এক মহা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধান কি বলকানীকরণ? না হিন্দীকরণ? প্রথমটাতে উত্তর ভারতের সুবিধা, দ্বিতীয়টাতে দক্ষিণ ভারতের। পূর্ব ভারতের মতিগতি দুর্বোধ্য। স্টীল ফ্রেম না হোক, ফ্রেম তো একটা থাকবে। না সেটাও থাকবে না?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com